দৈনিক সংবাদ

2003

উত্তরাঞ্চলের ৮ জেলায় শিক্ষার করুণ হাল

- প্রতি বছর সরকারের ২০ কোটি টাকা গচ্চা
- ছাত্রছাত্রীর চেয়ে কর্মচারী বেশি
- অবকাঠামো নেই, সরকারি অনুদান পাচ্ছে
- মাদ্রাসা শিক্ষার নামে হরিলুট

শিরাকত আলী বাদল । রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের ৮ জেলায় বেসরকারি হাইস্কুল, জুনিয়র হাইস্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে পাঠদানের নামে চলছে চরম অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানাবিধ কারণে। ফলে শিক্ষার মান একেবারে নিচে নেমে গেছে। সকলের ওপর নির্ভরশীল হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন ধ্বংসের মুখে এসে পড়েছে। নিয়মনীতি ছাড়াই রাজনৈতিক কারণে এবং অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকা, ছাত্রছাত্রী স্বল্পতা, শিক্ষকদের পাঠদানে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ব্যাঙের ছাতার মতো শত শত হাইস্কুল, জুনিয়র হাইস্কুল, মাদ্রাসা সরকারি এমপিও করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এতে করে প্রতি বছর গড়ে ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগার থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসিক বেতনের পিছনে

শিক্ষা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

শিক্ষা ঃ হাল (১২ পৃষ্ঠার পর)

অহেতুক ব্যয় করতে হচ্ছে। সাইনবোর্ড সর্বস্ব ছাত্রছাত্রীবিহীন মাদ্রাসা গজিয়ে উঠেছে উত্তরাঞ্চলের ৮ জেলায়, তারা আবার সরকারি অনুদান পেয়েছে। ৮ শতাধিক মাদ্রাসা রয়েছে, যেখানে ২০/২৫ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী নেই অথচ শিক্ষক-কর্মচারী আছেন ২৫/৩০ জন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ম-দুর্নীতি দেখার যেন কেউ নেই, কোন মনিটরিং পর্যন্ত হয় না। এভাবেই চলছে শিক্ষার নামে হরিলুট কারবার।

রংপুরের উপ-পরিচালক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ৮ জেলায় সরকারি হাইস্কুল রয়েছে ৩৮টি। বেসরকারি হাইস্কুল রয়েছে আড়াই হাজার, জুনিয়র হাইস্কুল (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) ৬শ'টি, মাদ্রাসা রয়েছে ১ হাজার ৫শ' ২২টি। সরকারি বাদে বাকিগুলো সরকারি এমপিও ভুক্ত। প্রতিটি উপজেলার গ্রামে গ্রামে গজিয়ে উঠেছে হাইস্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, জুনিয়র স্কুল ও মাদ্রাসা। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ৪ মাইলের মধ্যে কোন বিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে না; কিন্তু সেই নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ১ কিলোমিটার কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে কম-দূরত্বের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। সেগুলো আবার এমপিও ভুক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, একই গ্রামে হাইস্কুল, মাদ্রাসা, বালিকা বিদ্যালয় এমনকি কলেজও রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হওয়ার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় থাকা সাংসদ এবং নেতাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সুপারিশ। ফলে উপজেলা পর্যায়ে ২/৪টি ছাড়া প্রতি উপজেলায় ৩/৪শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১শ' জনও নেই। কোন কোন স্কুলে ৩০/৪০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। মাদ্রাসাগুলোর আরও ভয়াবহ অবস্থা, ১০/১২ জন ছাত্র নিয়ে রয়েছে মাদ্রাসা। অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীর তুলনায় ছাত্রছাত্রী কম। বড় কর্তারা তদন্ত করতে আসলে আশপাশের মাদ্রাসা ও স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রী ধার করে নিয়ে আসা হয়। একই ছাত্রী একাধিক মাদ্রাসা ও স্কুলের ছাত্রী হিসেবে বাৎসরিক বৃত্তির অর্থ গ্রহণ করছে। এত গেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা।

শিক্ষার মান বলতে যা বোঝায় উপজেলা সদর ছাড়া গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৯০ ভাগ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নেই, অভিজ্ঞ শিক্ষকও নেই, লাখ লাখ টাকা ডোনেশন নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করায় মেধাবী ছাত্রছাত্রী শিক্ষকতায় চাকরি পায় না। তার ওপর বেশিরভাগ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় নিয়ম অনুযায়ী পাঠদান করা হয় না। ঠিকমত ক্লাস হয় না, নির্ধারিত সময়ের আগে স্কুল ছুটি দিয়ে দেয়া হয়। সারা বছর স্কুলে না এসেও বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যায়। নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া যায়। শিক্ষার মান নেই বললেই চলে। শুধু তাই নয়, এসএসসি পরীক্ষায় দেখা যায়, শহরের বিদ্যালয়ের চেয়ে উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। বাস্তবে শহরের অনেক ছেলে মেয়ে নামকাওয়াস্তে ভর্তি হয়ে থাকে পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দেয়। উদ্দেশ্য- নকলের সুযোগ গ্রহণ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, যা এখন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এসব প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেনি।

অন্যদিকে ২ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও উত্তরাঞ্চলের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিপূর্ণভাবে সব বিষয়ের ক্লাস হচ্ছে না। মার্চে এসএসসি পরীক্ষা ও দাখিল পরীক্ষা শুরু হবে। ফলে এপ্রিল পর্যন্ত পড়াশোনা হবে না। অথচ প্রথম টার্মিনাল পরীক্ষা মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করার তেমন সুযোগও পেল না, তারা পরীক্ষা কি দেবে? রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের সরকারি স্কুলগুলোতে এ অবস্থা চলছে। গ্রামাঞ্চলে তো এখনও লেখাপড়া শুরু হয়নি। তার ওপর শহর ও উপজেলার শিক্ষকরা বাণিজ্যিক শিক্ষক হয়ে গেছেন। তারা প্রাইভেটে পড়াতে সময় ব্যয় করেন। ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেটে না পড়লে পরিক্ষায় ভাল নম্বর দেয়া হয় না- এ অরাজকতা চলছে। সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন স্বয়ং নীলফামারী জেলা শহরের কয়েকটি বিদ্যালয় আকস্মিক পরিদর্শন করতে গিয়ে চরম অনিয়ম প্রত্যক্ষ করেছেন।

এ ব্যাপারে উপ-পরিচালক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা বৃহস্পতিবার সংবাদকে জানিয়েছেন, আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২ জন জেলায়, ১ জন কর্মকর্তা নিয়ে হাজার হাজার বিদ্যালয় মনিটরিং করা সম্ভব নয়। মাদ্রাসাগুলোতে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম হচ্ছে। তাদের সুপারিশ ছাড়া মাদ্রাসা বোর্ড সরকারি অনুমোদন দিচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার মতো বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে না দিলে সরকারের কোটি কোটি টাকা গচ্চা যাবে, শিক্ষার মান উন্নত হবে না।